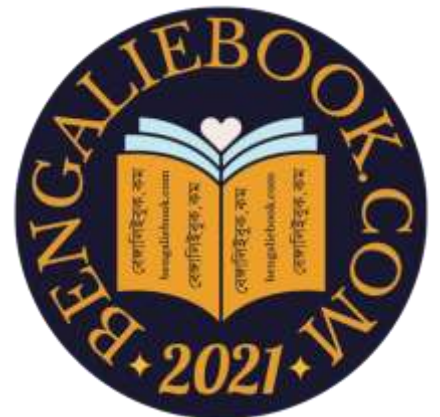


প্রবন্ধ

ব্যঙ্গকৌতুক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সূচিপত্র

• রসিকতার ফলাফল	2
• ডেঞ্চে পিপড়ের মন্তব্য	6
• প্রত্নতত্ত্ব	9
• লেখার নমুনা	15
• সারবান সাহিত্য	18
• মীমাংসা	23
• পয়সার লাঞ্ছনা	26
• কথামালার নূতন-প্রকাশিত গল্প	30
• প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ	32

রসিকতার ফলাফল

আর কিছুই নয়, মাসিক পত্রে একটা ভারি মজার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পড়িয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তো হাসিয়াছিলই, আবার শত্রুপক্ষও খুব হাসিতেছে।

অষ্টপাইকা, সাপ্টিবারি ও টাঙ্গাইল হইতে তিন জন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রবন্ধটির অর্থ কী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভদ্রতা করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহাতে ছাপাখানার গলদ আছে; আর-এক জন অনাবশ্যক সহৃদয়তাবশত লেখকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন; তৃতীয় ব্যক্তি অনুমান এবং আশঙ্কার অতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ, বস্তুত আমিই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি পাল হবিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন—

“গোবিন্দবাবুর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কী? ইহাতে কি ফরাসডাঙার তাঁতিদের দুঃখ ঘুচিবে? দেশে যে এত লোককে খেপা কুকুর কামড়াইতেছে এ প্রবন্ধে কি তাহার কোনো প্রতিকার কল্পিত হইয়াছে?”

“অজ্ঞানতিমিরনিবারণী” পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছে—

“গোবিন্দবাবু যদি সত্যই মনে করেন দেশে ধানের খেতে পাটের আবাদ হইয়া চাষাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে তবে তাঁহার প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আর যদি তিনি বলিতে চান পাট ছাড়িয়া ধানের চাষই শ্রেয় তবে সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু কোন্টা যে তাঁহার মত, প্রবন্ধ হইতে তাহা নির্ণয় করা দুর্লভ।’

দুর্লভ সন্দেহ নাই। কারণ, পাটের চাষ সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথাই বলি নাই।

“জ্ঞানপ্রকাশ” বলিতেছেন—

“লেখার ভাবে আভাসে বোধ হয় বালবিধবার দুঃখে লেখক আমাদের কাঁদাইবার চেষ্টা করিয়াছেন— কাঁদা দূরে যাক, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।’

হাস্যসম্বরণ করিতে না পারার জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ আভাসে যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিজগুণে।

“সম্মার্জনী”—নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছেন—

“হরিহরপুরের ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে গোবিন্দবাবুর যে সুগভীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রাঞ্জল ও ওজস্বী হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি বিষয়ে দুঃখিত ও আশ্চর্য হইলাম, ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন। এক স্থলে বলিয়াছেন, জন্মিলেই মরিতে হয়— এই চমৎকার ভাবটি যদি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম। নিম্নে আমরা কয়েকটি চোরাই মালের নমুনা দিতেছি— গিবন বলিয়াছেন, রাজ্যে রাজা না থাকিলে সমূহ বিশৃঙ্খলা ঘটে; গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, একে অরাজকতা তাহাতে অনাবৃষ্টি, গণ্ডেসোপরি বিস্ফোটকং। সংস্কৃত শ্লোকটিও কালিদাস হইতে চুরি। রাক্ষসে একটি বর্ণনা আছে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, সমুদ্রের জলে তাহার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। গোবিন্দবাবু লিখিয়াছেন, পঞ্চমীর চাঁদের আলো রামধনবাবুর টাকের উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। কী আশ্চর্য চুরি! কী অদ্ভুত প্রতারণা!! কী অপূর্ব দুঃসাহসিকতা!!!’

“সংবাদসার” বলেন—

“রামধনবাবু যে নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামাচরণবাবুর টাক নাই বটে, কিন্তু আমরা সন্ধান লইয়াছি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় অল্প অল্প টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিগত উল্লেখ অতিশয় নিন্দনীয়।’

আমার নিজেরই গোলমাল ঠেকিতেছে। আমার প্রবন্ধ যে হরিহরপুর ম্যুনিসিপালিটির বিরুদ্ধে লিখিত তৎসম্বন্ধে “মার্জনী”র যুক্তি একেবারে অকাট্য। হরিহরপুর চব্বিশ-পরগণায় না তিব্বতে না হাঁসখালি সবডিবিজনের অন্তর্গত আমি কিছুই অবগত নহি; সেখানে যে ম্যুনিসিপালিটি আছে বা ছিল বা ভবিষ্যতে হইবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর।

অপর পক্ষে, আমার প্রবন্ধে আমি নেউগিপাড়ার শ্যামাচরণ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত করিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা কঠিন। “সংবাদসার”এমনি নিবিড়ভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে ছুঁচ ঢালাইবার জো নাই। আমি একজনকে চিনি বটে, কিন্তু সে বেচারী ত্রিবেদী নয়, মজুমদার; তার বাড়ি নেউগিপাড়ায় নয়, ঝিনিদহে; আর তার ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় টাক থাকা চুলায় যাক, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রই নাই, দুইটি ভাগিনেয় আছে বটে।

যাঁহারা বলেন আমি বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনির মালেকদের চরিত্রের কালিমার সহিত উক্ত কয়লার তুলনা করিয়াছি, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উক্ত খনি আছে কি না এবং কোথায় আছে এবং থাকিলেই বা কী, যদি খোলসা করিয়া সমস্ত আমাকে লিখিয়া পাঠান তবে খনিরহস্য সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়। যিনি যাহাই বলুন “লুনের ট্যাক্স” “বিধবাবিবাহ” কিম্বা “গাওয়া ঘি” সম্বন্ধে যে আমি কিছুই বলি নাই তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

এ দিকে ঘরেও গোল বাধিয়াছে। গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়স্বরূপ আমি এক জায়গায় লিখিয়াছিলাম, এ জগৎটা পশুশালা। আমার ধারণা ছিল যে পাঠকেরা হাসিবে। অন্তত তিন জন পাঠক যে হাসেন নাই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। প্রথমত শ্যালক আসিয়া আমাকে গাল পাড়িল; সে কহিল, নিশ্চয়ই আমি তাহাকেই পশু বলিয়াছি। আমি কহিলাম, বলিলে অপরাধ হয় না, কিন্তু তোমার দিব্য, বলি নাই। ভ্রাতার অপমানে ব্রাহ্মণী পিতার ঘরে যাইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। জমিদার পশুপতিবাবু থাকিয়া থাকিয়া রাগে তাঁহার গোঁফজোড়া বিড়ালের ন্যায় ফুলাইয়া তুলিতেছেন। তিনি বলেন তাঁহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া অনধিকারচর্চা

করিয়াছি, এবং লোকসমাজে তিনি আমার সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা সুশ্রাব্য নয়। এ দিকে পাকড়াশি-বাড়ির জগৎবাবু চা খাইতে খাইতে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অটহাস্যের সঙ্গে মুখভ্রষ্ট চায়ের ও রুটির কণায় বজ্রবিদ্যুদ্বৃষ্টির কৃত্রিম দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে যেমনি পড়িলেন “জগৎটা পশুশালা” অমনি হাস্যের বেগ হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলায় চা বাঁধিয়া গেল- লোকে ভাবিল, ডাক্তার ডাকিবার সবুর সহিবে না।

পাড়াসুদ্ধ লোকের ধারণা যে, আমার প্রবন্ধে আমি তাহাদেরই পরমপূজনীয় জ্যাঠা, খুড়শ্বশুর অথবা ভাগ্নীজামাই সম্বন্ধে কোনো-না-কোনো সত্য কথার আভাস দিয়াছি; তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাথার খুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে এমন কথা প্রকাশ করিতেছে। আমার প্রবন্ধের গভীর অভিপ্রায়টি যে কী তৎসম্বন্ধে আমার কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের অভিপ্রায় যে কী তৎসম্বন্ধে তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু আমার পক্ষে নাই। বস্তুত তাহাদের ভাষা উত্তরোত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মনে করিয়াছি বাসা বদলাইতে হইবে, আমার রচনার ভাষাও বদলানো আবশ্যিক। আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।

১২৯২

ডেএও পিঁপড়ের মন্তব্য

দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে- ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেএও, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্মত, ওই পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।

হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হ'ত আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে- একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাত! সত্যি বলছি, আমার দেখতে ভারি মজা লাগে।

আমার পা দেখো আর ওদের পা দেখো! যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ের আর অন্ত দেখি নে, এতবড়ো পা! পদমর্যাদা এর চেয়ে আর কী আশা করা যেতে পারে! কিন্তু পিঁপড়েরা আমাদের খুদে খুদে পা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। হাজার হোক, পিঁপড়ে কিনা।

ওরা একে ক্ষুদ্র, তাতে আবার আমি বিস্তর উঁচু থেকে দেখি- ওদের সবটা আমার নজরে আসে না। কিন্তু আমি আমার অতি দীর্ঘ ছ পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে কটাক্ষে দৃকপাত করে আন্দাজে ওদের আগাগোড়াই বুঝে নিয়েছি। কারণ, পিঁপড়ে এত ক্ষুদ্র যে ওদের দেখে ফেলতে অধিক ক্ষণ লাগে না। পিঁপড়ে-জাতি সম্বন্ধে আমি ডাঁই ভাষায় একটা কেতাব লিখিব এবং বক্তৃতাও দেব।

পিঁপড়ে-সমাজ সম্বন্ধে আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ আছে। ডেএওদের সন্তানস্নেহ আছে, অতএব পিঁপড়েরা তা কখনোই থাকতে পারে না; কারণ, তারা পিঁপড়ে, কেবলমাত্র পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোনা যায় পিঁপড়েরা

মাটিতে বাসা বানাতে পারে; স্পষ্টই বোধ হচ্ছে তারা ডেএও জাতির কাছ থেকে স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করছে- কারণ, তারা পিঁপড়ে, সামান্য পিঁপড়ে, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে পিপীলিকা।

পিঁপড়াদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমন-কি, আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেএও-সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেএও-ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়াদের বাসার মধ্যে বাসস্থাপন করি এবং পিঁপড়ে-সংস্কারকার্যে ব্রতী হই- এতদূর পর্যন্ত ত্যাগস্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি। তাদের শর্করকণা গলাধঃকরণ করে এবং তাদের বিবরের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে কোনোক্রমে আমরা জীবনযাপন করতে রাজি আছি, যদি এতেও তারা কিছুমাত্র উন্নত হয়।

তারা উন্নতি চায় না- তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেএও তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব- আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।

যদি জিজ্ঞাসা কর তাদের শর্করা আমরা কেন খাব এবং তাদের বিবরে কেন বাস করব তবে তার প্রধান কারণ এই দেখাতে পারি যে, তারা পিঁপড়ে এবং আমরা ডেএও! দ্বিতীয়, আমরা নিঃস্বার্থভাবে পিঁপড়াদের উন্নতিসাধনে ব্রতী হয়েছি, অতএব আমরা তাদের শর্করা খাব এবং বিবরেও বাস করব। তৃতীয়, আমাদের প্রিয় ডাঁইভূমি ত্যাগ করে আসতে হবে, সেইজন্য, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য, শর্করা কিছু অধিক পরিমাণে খাওয়া আবশ্যিক। চতুর্থ, বিদেশে বিজাতির মধ্যে বিচরণ করতে হবে, নানা রোগ হতে পারে- তা হলে বোধ করি আমরা বেশি দিন বাঁচব না- হায়, আমাদের কী শোচনীয় অবস্থা! অতএব শর্করা খেতেই হবে, এবং বিবরেও যতটা স্থান আছে সমস্ত আমরা এবং আমাদের শ্যালকেরা মিলে ভাগাভাগি করে নেব।

পিঁপড়েরা যদি আপত্তি করে তবে তাদের বলব, অকৃতজ্ঞ! যদি তারা শর্করা খেতে এবং বিবরে স্থান পেতে চায় তবে ডাঁই ভাষায় তাদের স্পষ্ট বলব, তোমরা পিঁপড়ে, ক্ষুদ্র, তোমরা পিপীলিকা। এর চেয়ে আর প্রবল যুক্তি কী আছে!

তবে পিঁপড়েরা খাবে কী! তা জানি নে। হয়তো আহার এবং বাসস্থানের অকুলান হতেও পারে, কিন্তু এটা তাদের ধৈর্য ধরে বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের দীর্ঘপদস্পর্শে ক্রমে তাদের পদবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। শৃঙ্খলা এবং শান্তির কিছুমাত্র অভাব থাকবে না। তারা ক্রমিক উন্নতি লাভ করুক এবং আমরা ক্রমিক শর্করা খাই, এমনি একটা বন্দোবস্ত থাকলে তবেই শৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষা হবে, না হলে তুমুল বিবাদের আটক কী?— মাথায় গুরুভার পড়লে এতই বিবেচনা করে চলতে হয়।

শর্করাভাবে এবং অতিরিক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার ভারে যদি পিঁপড়ে জাতি মারা পড়ে? তা হলে আমরা অন্যত্র উন্নতি প্রচার করতে যাব— কারণ, আমরা ডেএণ্ড জাতি, উচ্চ পদের প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত।

চৈত্র, ১২৯২

প্রত্নতত্ত্ব

১

প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও

অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারেই এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ছিল না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। প্রকৃত কথা, আধুনিক ভারতে অনুসন্ধান ও গবেষণার নিতান্ত অভাব। বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলেই পাঠকেরা দেখিবেন, আমাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই এবং তাহাতে যথেষ্ট ফললাভও হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল কি না ও অক্সিজেন বাষ্পের কী নাম ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার পূর্বে কীটকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের জীবিতকাল নির্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যিক।

প্রথমত, কীটকভট্ট কোন্ রাজার রাজত্বকালে বাস করিতেন সেইটি নিঃসংশয়রূপে স্থির করা যাউক। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি পুরন্দরসেনের মন্ত্রী, অন্য মতে তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেখিতে হইবে পুরন্দরসেন কয়জন ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কে মিথিলায়, কে উৎকলে এবং কেই বা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহার রাজত্বকাল খৃষ্ট-শতাব্দীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, কাহার নয় শত বৎসর পরে এবং কাহারই বা খৃষ্ট-শতাব্দীর সমসাময়িক কালে। বোধনাচার্য তাঁহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পরম্পারম্প্রথিত-পথিকৌ (মধ্যে পুঁথির দুই পাতা পাওয়া যায় নাই) লসত্যসৌ। এই শ্লোকের অর্থ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বকোবিদ পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইতেছে না।

কারণ, নৃপতিনির্ঘন্ট গ্রন্থে উত্কসূরি লিখিতেছেন- নিগ..নন্দ..পরন্ত..ঞ্জং। ইহার মধ্যে যেটুকু অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই কীটে নিঃশেষপূর্বক পরিপাক করিয়াছে। যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা বোধনাচার্যের লেখনের কোনো সমর্থন করিতেছে না ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু উভয়ের লেখার প্রামাণিকতা তুলনা করিতে গেলে, বোধনাচার্য ও উত্কসূরির জন্মকালের পূর্বাপরতা স্থির করিতে হয়।

দেখা যাউক, চীন-পরিব্রাজক নিন্ফু বোধনাচার্য সম্বন্ধে কী বলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বলেন না।

আমরা আরব-ভ্রমণকারী আল্‌করীম, পর্তুগীজ ভ্রমণকারী গঞ্জলিস ও গ্রীক দার্শনিক ম্যাক্‌ডীমসের সমস্ত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলাম। প্রথমত ইহাদের তিন জনের ভ্রমণকাল নির্ণয় করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। আমরাও তাহাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রবন্ধ-সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৎপূর্বে বলা আবশ্যিক যে, উক্ত তিন ভ্রমণকারীর কোনো রচনায় বোধনাচার্য অথবা উত্কসূরির কোনো উল্লেখ নাই। নিন্ফুর গ্রন্থে হলাও-কো-নামক এক ব্যক্তির নির্দেশ আছে। পুরাতত্ত্ববিদ্যামাত্রেই হলাও-কো নাম বোধনাচার্য নামের চৈনিক অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু হলাও-কো বোধনাচার্যও হইতে পারে, শম্বরদত্ত হইতেও আটক নাই।

অতএব পুরন্দরসেন একজন ছিলেন কি অনেক জন ছিলেন কি ছিলেন না, প্রথমত তাহার কোনো প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত, উক্ত সংশয়াপন্ন পুরন্দরসেনের সহিত কীটকভট্ট অথবা পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের কোনো যোগ ছিল কি না ছিল, তাহা নির্ণয় করা কাহারো সাধ্য নহে।

অতএব, উক্ত কীটকভট্ট ও পুণ্ড্রবর্ধন মিশ্রের রচিত মোহান্তক ও জ্ঞানাজ্ঞন-নামক গ্রন্থে যদি গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন বাষ্পের কোনো উল্লেখ না পাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয় বলা শক্ত। শুদ্ধ এই পর্যন্ত বলা যায় যে, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সময়ে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয় নাই।

কিন্তু সে সময়টা কী তাহা আমি অনুমান করিলে মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিবাদ করিবেন এবং তিনি অনুমান করিলে আমি প্রতিবাদ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, কীটক ও পুণ্ড্রবর্ধনের নিকট এইখানে বিদায় লইতে হইল। তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইল, এজন্য পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রথমত নন্দ উপনন্দ আনন্দ ব্যোমপাল ক্ষেমপাল অনঙ্গপাল প্রভৃতি আঠারো জন নৃপতির কাল ও বংশাবলী-নির্ণয় সম্বন্ধে মধুসূদন শাস্ত্রীর মত খন্ডন করিয়া সোমদেব চৌলুকভট্ট শঙ্কর কৃপানন্দ উপমন্যু প্রভৃতি পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্ধারণ করিতে হইবে; তাহার পর তাঁহাদের রচিত বোধপ্রদীপ আনন্দসরিৎ মুক্তচৈতন্যলহরী প্রভৃতি পঞ্চগল্পখানি গ্রন্থের জীর্ণাবশেষ আলোচনা করিয়া দেখাইব, উহাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থেই গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি অথবা অক্সিজেনের নামগন্ধ নাই। উক্ত গ্রন্থসমূহে ঘটচক্রভেদ সর্পদংশনমন্ত্র রক্ষাবীজ আছে এবং একজন পণ্ডিত এমনও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্বপ্নে নিজের লাঙ্গুল দর্শন করিলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান ও কুণ্ডপতনক-নামক চাতুর্মাস্য ব্রতপালন আবশ্যিক; কিন্তু ব্যাটারি ও বাষ্প বিষয়ে কোনো বর্ণনা বা বিধান পাওয়া গেল না। আমরা ক্রমশ ইহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া ইতিহাসহীনতা সম্বন্ধে ভারতের দুর্নাম দূর করিব; প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিব যে, পুরাকালে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ভারতখণ্ডে ছিল না এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্সিজেন বাষ্পের কোনো নাম পাওয়া যায় না।

২

মধুসূদন শাস্ত্রীমহাশয় কর্তৃক উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন; অতএব প্রাচীন ভারত, সাবধান! কোথায় খোঁচা লাগে কি জানি। অপোগণ্ডের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন! অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যতলেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত

করিয়া বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই আমড়াতলার দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা!

আমাদের দেশে যে এক কালে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাই বাঙালি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? তাহা হইলে তোমার এমন দশা হইবে কেন? আজ যে তুমি লাঞ্চিত, গঞ্জিত, তিরস্কৃত, পরপদানত, অন্নবস্ত্রহীন, দাসানুদাস ভিক্ষুক, জগতে তোমার এমন অবস্থা হয় কেন? কোন্ দিন তুমি এবং তোমাদের সাহিত্য-সংসারের এই সার সঙটি বলিয়া বসিবেন, অসভ্য ভারতের বাতাসে অক্সিজেন বাষ্পই ছিল না এবং বিদ্যুৎ খেলাইতে পারে ভারতের অশিক্ষিত আকাশ এমন এন্লাইটেণ্ড ছিল না।

তাই বাঙালি, তুমি এন্লাইটেণ্ড, বাতাসের সঙ্গে তুমি অনেক অক্সিজেন বাষ্প টানিয়া থাক এবং তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে। আমি মুর্থ, আমি কুসংস্কারচ্ছন্ন তাই, তাই, আমি বিশ্বাস করি প্রাচীন ভারতে গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ছিল এবং অক্সিজেন বাষ্পের অস্তিত্বও অবিদিত ছিল না। কেন বিশ্বাস করি? আগে নিষ্ঠার সহিত কূর্ম কঙ্কি ও স্কন্দ পুরাণ পাঠ করো, গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি স্থাপন করো, স্লেচ্ছের অন্ন যদি খাইতে ইচ্ছা হয় তো গোপনে খাইয়া সমাজে অস্বীকার করো, যতটুকু নব্য শিক্ষা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও, তবে বুঝিতে পারিবে কেন বিশ্বাস করি। আজ তোমাকে যাহা বলিব তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমার যুক্তি তোমার কাছে অজ্ঞের প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

তবু একবার জিজ্ঞাসা করি, কীটে যতটা খাইয়াছে এবং মুসলমানে যতটা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার কি একটা হিসাব আছে! যে পাপিষ্ঠ যবন ভারতের পবিত্র স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে, ভারতের গ্যালভ্যানিক ব্যাটারির প্রতি যে তাহারা মমতা প্রদর্শন করিবে ইহাও কি সম্ভব! যে স্লেচ্ছগণ শত শত আর্যসন্তানের পবিত্র মস্তক উন্মীষ ও শিখা-সমেত উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে আমাদের পবিত্র দেবভাষা হইতে অক্সিজেন বাষ্পটুকু উড়াইয়া দিবে ইহাতে কিছু বিচিত্র আছে?

এই তো গেল প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যদি যবনগণের দ্বারাই গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের প্রাচীন নাম লোপ না হইবে, তবে তাহা গেল কোথায়- তবে কোথাও তাহার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না কেন? প্রাচীন শাস্ত্রে এত শত ঋষি-মুনির নাম আছে, তন্মধ্যে গল্বন ঋষির নাম বহু গবেষণাতেও পাওয়া যায় না কেন? যে পবিত্র ভারতে দধীচি বজ্রনির্মানের জন্য নিজ অস্থি ইন্দ্রকে দান করিয়াছেন, ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন এবং জহুমুনি গঙ্গাকে এক গণ্ডুষে পান করিয়া জানু দিয়া নিঃসারিত করিয়াছেন, যে ভারতে ঋষিবাক্যপালনের জন্য বিষ্ণুপর্বত আজিও নতশির, সেই ভারতের সাহিত্য হইতে অক্সিজেন বাষ্পের নাম পর্যন্ত যে লুপ্ত হইয়াছে, সর্বসংহারক যবনের উপদ্রবই যদি তাহার কারণ না হয়, তবে হে বাঙালি, তাহার কী কারণ আছে জিজ্ঞাসা করি।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, ইতিহাসের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, যবনেরা প্রাচীন ভারতের বহুতর কীর্তি লোপ করিয়াছে। এ কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজ যে আমরা নিন্দিত অপমানিত ভীত দ্রুস্ত ভয়গ্রস্ত রিক্তহস্ত অস্তংগমিতমহিমা পরাধীন হইয়াছি, ভারতে যবনাধিকারই তাহার একমাত্র কারণ। এতটা দূরই যদি স্বীকার করিতে পারিলাম, তবে আমাদের গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি ও অক্সিজেনের নামও যে সেই দুরাত্মারাই লোপ করিয়াছে এটুকু যোগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবার তিলমাত্র কারণ দেখি না।

চতুর্থ যুক্তি, যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্বিচারে বহুতর পুত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সেজন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোনো উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার করে সে পাষণ্ড, হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী! অতএব, তাহার কথার কোনো মূল্য থাকিতে পারে না; সে যে-সকল প্রমাণ আহরণ করে কোনো প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতেই পারেন না।

এমন যুক্তি আমরা আরও অনেক দিতে পারি। কিন্তু আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।

১২৯৮

লেখার নমুনা

সম্পাদকমহাশয়-সমীপেষু-

ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু না বলিয়া থাকিতে পারি না, আপনারা এখনো লিখিতে শিখেন নাই। অমন মৃদুসস্তাষণে কাজ চলে না। গলায় গামছা দিয়া লোক টানিতে হইবে। কিন্তু উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ বলিয়া আমাদের এজেন্সি আপিস হইতে একটা লেখার নমুনা পাঠাইতেছি। পছন্দ হইলে ছাপাইবেন, দাম দিতে ভুলিবেন না। যিনি লিখিয়াছেন তিনি সাহিত্যসংসারে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বাঙ্গালার ভূগোলে সাহিত্যসংসার কোথায় আছে ঠিক জানি না; এই পর্যন্ত জানি, আমাদের বিখ্যাত লেখককে তাঁহার ঘরের লোক ছাড়া আর কেহই চেনেন না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে, সাহিত্যসংসার বলিতে তিনি, তাঁহার বিধবা পিসি, তাঁহার স্ত্রী এবং দুই বিবাহযোগ্যা কন্যা বুঝায়। এই ক্ষুদ্র সাহিত্যসংসারটির জীবিকা আমাদের খ্যাতনামা লেখকটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল সময়ে রুচি রক্ষা করিয়া, সত্য রক্ষা করিয়া, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া লিখিলে ইঁহার কোনোমতে চলে না; অতএব উপযুক্ত লেখক এমন আর পাইবেন না।

তবু কেন বলি

দেখিয়া বিস্মিত আশ্চর্য এবং চমৎকৃত হইতে হয়, কী বলিব, চক্ষে জল আসে, কান্না পায়, অশ্রুসলিলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, যখন দেখিতে পাই, যখন প্রত্যহ এমন-কি, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যায়-কী দেখা যায়! পোড়া মুখে কেমন করিয়া বলিব কী দেখা যায়! বলিতে লজ্জা হয়, শরম আসে, মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা হয়, উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে, মাতঃ বসুন্ধরে, জননী, মা, মা গো, একবার দ্বিধা হও মা- একবার দুখানা হইয়া ভাঙিয়া যা মা, সন্তানের লজ্জা নিবারণ কর্ জননী। ভাই বঙ্গবাসী, বুঝিয়াছ কি, কোন্ কলঙ্কের কথা, কোন্ লাঞ্ছনার কথা, কোন্ দুঃসহ লজ্জার কথা বলিতেছি, ব্যক্ত করিতেছি, প্রকাশ করিতে গিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া

যাইতেছে? না, বোঝ নাই, তোমরা বুঝিবে কেন ভাই? তোমরা মিল্ বোঝ, স্পেন্সর বোঝ, তোমরা শেলির আধো-আধো ছায়া-ছায়া ভাঙা-ভাঙা কবিত্ব বোঝ, তোমরা গরিবের কথা বুঝিবে কেন, দরিদ্রের কথা শুনিবে কেন, এ অকিঞ্চনের ভাষা তোমাদের কানে যাইবে কেন? কিন্তু ভাই, একটি প্রশ্ন আছে, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, গুণমণি, ওই মুখের একটি উত্তর শুনিতে চাই-আচ্ছা ভাই, পরের কথা বোঝ, আর আপনার লোকের কথা বোঝ না, বাহিরের কথা বোঝ আর ঘরের কথা বুঝিতে পার না, যে আপনার নয় তাহার কথা বোঝ-যে আপনার তাহার কথা বোঝ না? বোঝ না তাহাতেও দুঃখ নাই, তাহাতেও খেদ নাই, তাহাতেও তিলার্থমাত্র শোকের কারণ নাই, কিন্তু ভাই, কথাটা যে একেবারেই হৃদয়ঙ্গমই হয় না, একেবারে যেন অবোধের মতো বসিয়া থাক! সেই তো আমাদের দুর্দশা, সেই তো আমাদের দুরদৃষ্ট। ভাই বাঙালি, জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে, যে কথা আজিকার দিনে কেহ বুঝিবে না সে কথা তুলিলে কেন, উত্থাপন করিলে কেন? যে কথা সবাই ভুলিয়াছে সে কথা মনে করাইয়া দাও কেন? যে দুর্বিষহ বেদনা, যে দুঃসহ ব্যথা, যে অসহ্য যন্ত্রণা নাই তাহাতে আঘাত দাও কেন? আমিও তো সেই কথা বলি ভাই। এই ভাঙা মন্দিরে এই ভাঙা কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কেন তুলি! এই শ্মশানের চিতানলে আবার কেন নূতন করিয়া নয়নজল নিক্ষেপ করি! আর্যজনীর সমাধিক্ষেত্রে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসিত সভ্যচালিত নবসভ্যতার দিনে আবার কেন নূতন করিয়া নীরবতার তরঙ্গ উত্থিত করি! কেন করি! তোমরা কী করিয়া বুঝিবে ভাই, কেন করি! তুমি যে ভাই, সভ্য, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে ভাই, নবসভ্যতার নূতন বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন তানে নূতন গান ধরিয়াছ, নূতন রসে নূতন মজিয়া নূতন ভাবে নূতন ভোর হইয়াছ, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তুমি যে এ কথা কখনো কিছু শোন নাই এবং আজ সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি যে এ কথা কখনো কিছু বোঝ নাই এবং আজ একেবারেই বোঝ না, তুমি কী করিয়া বুঝিবে কেন করি! তবু জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি? আমি যে ভাই, তোমাদের মিল্ পড়ি নাই, তোমাদের স্পেন্সর পড়ি নাই, তোমাদের ডারুয়িন পড়ি নাই; আমি যে ভাই, তোমাদের হক্সলি এবং টিণ্ডাল, রাফিন এবং কার্লাইল পড়ি নাই এবং পড়িয়া বুঝিতে পারি নাই; আমি যে ভাই, কেবলমাত্র ষড়্দর্শন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ, সংহিতা এবং পুরাণ, আগম এবং নিগম, উপক্রমণিকা

এবং ঋজুপাঠ প্রথম-ভাগ পড়িয়াছি-ওই-সকল গ্রন্থ এই পতিত ভারতে আমি ছাড়া আর যে কেহ পড়ে নাই এবং বুঝে নাই ভাই। তবু আবার জিজ্ঞাসা করিবে কেন করি! প্রাণের ভাইসকল, আমি যে পাগল, বাতুল, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত, আমার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির স্থিরতা নাই, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত!

ভাই বাঙালি, এখন বুঝিলে কি, কেন করি, অবোধ অশ্রু কেন পড়ে, পোড়া চোখের জল কেন বারণ মানে না, কেন মিছে অরণ্যে রোদন, অস্থানে ক্রন্দন করিয়া মরি! নীরব হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত হইল কি, এই ভস্মীভূত প্রাণের শিখা দেখিতে পাইলে কি, শুষ্ক অশ্রুধারা দুই কপোল বাহিয়া কি প্রবাহিত হইল? যে ধ্বনি কখনো শোন নাই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে কি, যে আশা কখনো হৃদয়ে স্থান দাও নাই তাহার নৈরাশ্য তিলমাত্র অনুভব করিলে কি, যাহা বুঝাইতে গেলে বুঝানো যায় না এবং যাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা উত্তরোত্তর অসাধ্য হইয়া উঠে তাহা কি আজ তোমাদের এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারুদ্ধ বধির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।-

সম্পাদক মহাশয়, আজ এই পর্যন্ত প্রকাশ করা গেল। কারণ ইহার পরের প্যারাগ্রাফেই আমাদের লেখক আরম্ভ করিয়াছেন, “যদি না করিয়া থাকে তবে আমি ক্ষান্ত হইলাম, নীরব হইলাম, তবে আমি মুখ বন্ধ করিলাম, তবে আমি আর একটি কথাও কহিব না-না, একটিও না।” এই বলিয়া কেন কথা কহিবেন না, শ্মশানক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ ফল হয় এবং সমাধিক্ষেত্রে কথা বলিলেই বা কিরূপ নিষ্ফল হয়, এবং কথা বলিলেই বা কিরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইলেই বা কিরূপ কথা বাহির হইতে থাকে, তাহাই ভাই বাঙালিকে পুনরায় বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। এই অংশটি এত দীর্ঘ যে, আপনার কাগজে স্থান হইবে না। পাঠকদিগকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে, প্রবন্ধটি অবিলম্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। মূল্য ৫৪০ মাত্র, কিন্তু যাঁহারা ডাক-মাণ্ডল-স্বরূপে উক্ত ৫৪০ পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে।

-সাহিত্য এজেন্সির কার্যাধ্যক্ষ

সারবান সাহিত্য

সম্পাদক মহাশয়,

আজকাল বাংলা সাহিত্যে রাশি রাশি নাটক-নভেলের আমদানি হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই। না আছে তত্ত্বজ্ঞান, না আছে উপদেশ। কী করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, গোজাতির রোগনিবারণ করিবার কী কী উপায় আছে, দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্ বাদ শ্রেষ্ঠ, কফ পিত্ত ও বায়ু-বৃদ্ধির পক্ষে দিশি কুমড়া ও বিলাতি কুমড়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কি না, অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে-আমাদের অগণ্য কাব্যনাটকের মধ্যে এ-সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না। একবার কল্পনা করিয়া দেখুন, যদি কোনো নাটকের পঞ্চমাঙ্কের সর্বশেষভাগে এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় যদ্বারা জৈবশক্তি ও দৈবশক্তির অন্যান্য সম্বন্ধ নিরূপিত হয় অথবা সৃষ্টিবিকাশের ক্রমপর্যায় নাটকের অঙ্কে অঙ্কে বিভক্ত হইয়া দুর্গম জ্ঞানশিখরের মরকত-সোপান-পরম্পরা রচিত হয়, তবে রসগ্রাহী সহৃদয় পাঠকেরা কিরূপ পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখন যে-সকল অসার ম্লেচ্ছভাবসংস্পর্শদূষিত গ্রন্থ বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া বাবুরা সাহেব এবং ঘরের গৃহিণীরা বিবি হইতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার মানসে আমি নাটক-উপন্যাসের ছলে কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় পঞ্জিকা নাট্যাকারে বাহির করিব স্থির করিয়াছি। গ্রন্থ-ফলাফলের প্রতি বর্তমান কালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাবু-বিবিদিগের বিশ্বাস ক্রমশ হ্রাস হইতেছে। সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিবার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। সাধারণের চিত্ত-আকর্ষণের অভিপ্রায়ে এই নাটকের কিঞ্চিৎ নমুনা মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

নাটকের পাত্রগণ

হর

পার্বতী

প্রথম অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাসপর্বত

হরপার্বতী

পার্বতী। নাথ!

হর। কেন প্রিয়ে?

পার্বতী। শ্বেতবরাহ কল্পাদি হইতে কয়জন মনুর আবির্ভাব হইয়াছে সেই মনোহর প্রসঙ্গ শুনিলার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

হর। (সহাস্যে) প্রিয়ে, পঞ্জিকার প্রথম সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ষারম্ভদিনে এই পরমজিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরে তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া আসিতেছি। জীবিতবল্লভে, আজও কি এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা জন্মিল না?

পার্বতী। প্রাণনাথ, জানই তো আমরা বুদ্ধিহীন নারীজাতি, বিশেষত আজকালকার বিবিদের মতো ফিমেল ইন্সকুলে পড়ি নাই। (বোধ করি সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন, এইখানে বর্তমান শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ করা হইল। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা অনেকটা নিবারণ হইবে।-লেখক) হৃদয়নাথ, অহর্নিশি একমাত্র পতিচিন্তা ব্যতীত যাহার আর কোনো চিন্তা নাই তাহার স্মৃতিপটে অতগুলো মনুর কথা কিরূপে অঙ্কিত হইবে? হাজার হউক, তাহারা তো পরপুরুষ বটে। (বর্তমান কালের পাঠিকারা এইস্থল হইতে পতিভক্তির সুন্দর উপদেশ পাইবেন। -লেখক)

হর। প্রিয়তমে, তবে অবহিত হইয়া মনোহর কথা শ্রবণ করো। শ্বেতবরাহ কল্পাদির পর হইতে ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু। দ্বিতীয় স্বরোচিষ মনু। তৃতীয় উত্তমজ মনু। চতুর্থ তামস মনু। পঞ্চম রৈবত মনু। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু। সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। সপ্তবিংশতি যুগ গত

হইয়াছে। অষ্টবিংশতি যুগে কলিযুগের প্রারম্ভ। তত্র চতুর্যুগের পরিমাণ বিংশতিসহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশলক্ষ-পরিমিত বর্ষ।

পার্বতী। (স্বগত) অহো কী শ্রুতিমনোহর! (প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বর, এবার সত্যযুগোৎপত্তির কাল নিরূপণ করিয়া দাসীর কর্ণকুহর সুধাসিক্ত করো।

হর। প্রিয়ে, তবে শ্রবণ করো। বৈশাখ শুক্লপক্ষ অক্ষয়তৃতীয়া রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তি। ইত্যাদি।

(এইরূপে কাব্যকৌশলসহকারে প্রথম অঙ্কে একে একে চারি যুগের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণিত হইবে। -লেখক)

দ্বিতীয় অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস

বৃষস্কন্ধে মহেশ এবং শিলাতলে হৈমবতী আসীনা। নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যসাধনের জন্য হরপার্বতীর নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে বৃষের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কোনো রঙ্গভূমিতে এই নাটকের অভিনয় হয় নিশ্চয়ই বৃষ সাজিবার লোকের অভাব হইবে না। বক্ষ্যমাণ অঙ্কে পার্বতী মধুর সম্ভাষণে মহেশ্বরের নিকট হইতে বর্ষফল জানিয়া লইতেছেন। এই অঙ্কে প্রসঙ্গক্রমে সোনার ভারতের দুর্দশায় পার্বতীর বিলাপ এবং রেলগাড়ি প্রচলিত হওয়াতে আর্যাবর্তের কী কী অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা কৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে আঢ়কেশফল কুড়বেশফল এবং গোটিকাপাতফল-নামক সুখশ্রাব্য প্রসঙ্গে এই অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক এবং চতুর্থ অঙ্ক। দৃশ্য কৈলাস।

গজচর্মে ত্র্যম্বক ও অম্বিকা আসীনা

নাট্যশালায় গজচর্মের আয়োজন যদি অসম্ভব হয়, কার্পেট পাতিয়া দিলেই চলিবে। এই দুই অঙ্কে বারবেলা, কালবেলা, পরিঘযোগ, বিষ্ণুযোগ, অস্কযোগ, বিষ্টিভদ্রা, মহাদক্ষা, নক্ষত্রফল, রাশিফল, ববকরণ, বালবকরণ, তৈতিলকরণ,

কিন্তুয়করণ, ঘাতচন্দ্র, তারাপ্রতিকার, গোচরফল প্রভৃতির বর্ণনা আছে। অভিনেতাদিগের প্রতি লেখকের সবিনয় অনুরোধ, এই দুই অঙ্কে তাঁহারা যথাযথ ভাব রক্ষা করিয়া যেন অভিনয় করেন- কারণ অরিদ্বিদশ এবং মিত্রষড়ষ্টক-কথনে যদি অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে ভিন্নতা না থাকে, তবে দর্শকগণের চিত্তে কখনোই অনুরূপ ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না। -লেখক

পঞ্চমাস্ক। দৃশ্য কৈলাস

সিংহের উপর ত্রিপুরারি ও মহাদেবী আসীন

(সিংহের অভাবে কাঠের চৌকি হইলে ক্ষতি নাই। -লেখক)

মহাদেবী। প্রভু, দেবদেব, তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তোমার নখদর্পণে; এইবার বলো দেখি ১৮৭৯ সালের এক আইনে কী বলে।

ত্রিপুরারি। মহাদেবী, শুশুনিশুশুঘাতিনী, তবে অবধান করো। কোনো-একটি বিষয়ের অনেকগুলি দলিল হইলে তাহার মধ্যে প্রধানখানিতে নিয়মিত স্ট্যাম্প, অপরগুলিতে এক টাকা অনুসারে দিতে হয়।

ইহার পর দলিল রেজিস্টারির খরচা, তামাদির নিয়ম, উকিল-খরচা, খাজনা-বিষয়ক আইন, ইনকম্‌ট্যাক্স, বাঙ্গিডাক, মনিঅর্ডার, সর্বশেষ সাউথ ইন্টারন স্টেট রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার কথা বিবৃত করিয়া যবনিকাপতন। এই অঙ্কে যে ব্যক্তি সিংহ সাজিবে তাহার কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকিতে পারে; অতক্ষণ দুই জনকে স্কন্ধে করিয়া হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন ব্যাপার! সেই জন্য উকিল-খরচা-কথনের মধ্যে সিংহ একবার গর্জন করিয়া উঠিবে, “মা, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।” মা বলিলেন, “তা, যাও বাছা, সাহারা মরুতে তোমার শিকার ধরিয়া খাও গে, আমরা নীচে নামিয়া বসিতেছি।” হামাগুড়ি দিয়া সিংহ নিষ্ক্রান্ত হইবে। এই সুযোগে দর্শকেরা সিংহের আবাসস্থলের পরিচয় পাইবেন।- আমার কোনো কোনো নব্যবন্ধু পরামর্শ দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে মধ্যে নন্দীভূঙ্গির হাস্যরসের অবতারণা করিলে ভালো হয়। কিন্তু তাহা হইলে নাটকের গৌরব লাঘব হয়। এইজন্য

হাস্যপ্রগল্ভতা আমি সযত্নে দূরে পরিহার করিয়াছি। ভবিষ্যতে সুশ্রুত ও চরক-সংহিতা নাট্যাকারে রচনা করিবার অভিলাষ আছে এবং উপন্যাসের ন্যায় লঘু সাহিত্যকে কতদূর পর্যন্ত সারবান করিয়া তোলা যাইতে পারে পাঠকদিগকে তাহারও কিঞ্চিৎ নমুনা দিবার সংকল্প করিয়াছি।

ভবদীয় একান্ত অনুগত শ্রীজনহিতৈষী

সাহিত্যপ্রচারক

১২৯৮

মীমাংসা

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনো আমাদের বাড়ির ছাদে উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড়ো ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনো চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যাবেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রিকার সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন “বারণ কর্ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না”।

বুঝিতে পারি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছেন—

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?

উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধু নই। কারণ, আমি পুরুষমানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কস্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোকরা

নূতন বাঁশি অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে-প্রত্যুষ হইতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সারিগম সাধিতেছে। পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে; এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর সিকিসুর তফাত দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে; ঘরে আর কিছুতে মন টেকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন “বারণ কর্ লো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না”। শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম সাধিতেছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন-

যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।

বোধ হয় চণ্ডীদাসের বাসার পাশে কল্কটের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোকরা বাঁশি অভ্যাস করে বোধ হয় তাহারই নাম মুকুন্দ ঘোষ।

-শ্রীসংগীতপ্রিয়

আমার এ কী হইল! এ কী বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া “চমকি চমকি উঠি”।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।

শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী সখীকে ডাকিয়া বলি, “উছ উছ, সখী, দ্বার রোধ করিয়া দাও”।

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব।

মনোহরা শারদপূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী! কেবল আমার কষ্ট কেন
দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে?

আমার ন্যায় আর-কোনো হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন-

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।

অন্যত্র লিখিয়াছেন “নিশি নিশি রুজমুপযাতি”। আমারও সেই দশা। রাত্রেই
বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কী হইল?

উত্তর

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বার রোধ করিয়া দাও
সেটা ভালোই কর। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে।
পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ওই এক
লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ বাত পয়ার এবং জোয়ার-ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভালো
ডাক্তার ছিল না, তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা
সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

-নূতন- উত্তীর্ণ ডাক্তার

১২৯৮

পয়সার লাঞ্ছনা

আমাদের আপিসের সাহেব বলে, বাঙালির বেশি বেতনের আবশ্যক নাই। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, ভদ্র বাঙালির ছেলের পক্ষে মাসিক পঁচিশ টাকা খুব উচ্চ বেতন। আমাদের অবস্থা এবং আমাদের দেশের সম্বন্ধে সাহেবরা যখন একটা মত স্থির করে তখন তাহার উপর আমাদের কোনো কথা বলা প্রগল্ভতা। কেবল সাহেবের প্রতি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূচক বিশেষণ-প্রয়োগপূর্বক মনের ক্ষোভে আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি করি-সাহেব সবই তো জানেন।

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে। সে নিয়মের অর্থ এই-যাহার একটার অভাব তাহার আর-একটার বাহুল্য প্রায়ই থাকে। আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত।

কিন্তু জগতের এ নিয়ম কোনো কোনো জগদ্বাসীর পক্ষে যেমনই আনন্দজনক হউক আমাদের পক্ষে ঠিক তেমন সুবিধার বোধ হয় নাই। কেবল অগত্যা সহিয়াছিলাম, কিন্তু যেদিন আমাদের উপরে একটা কর্ম খালি হইল এবং বাহির হইতে একটা কাঁচা ইংরাজের ছেলেকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রমোশন বন্ধ করা হইল, সেদিন আমাদের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। ইচ্ছা হইল তখনই কাজ ফেলিয়া যদি চলিয়া যাই, একটা মিউটিনি করি, ইংরাজকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই, পার্লামেন্টে একটা দরখাস্ত করি, স্টেটস্ম্যান কাগজে একটা বেনামি পত্র লিখি। কিন্তু তাহার কোনোটা না করিয়া বাড়িতে চলিয়া গিয়া সেদিন আর জলখাবার খাইলাম না, খোকার সর্দি হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলাম, স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল, আমি সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হায় রে পয়সা, তোর জন্য এত অপমান!

স্ত্রী অভিমান করিয়া আমার কাছে আসিলেন না, কিন্তু নিঃশব্দচরণে নিদ্রাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কখন দেখিতে পাইলাম- আমি একটি পয়সা। কিছু আশ্চর্য বোধ হইল না। কবে কোন্ সনাতন টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছি যেন মনেও নাই। এই পর্যন্ত অবগত আছি যে, ব্রহ্মার পা হইতে যেমন শূদ্রের উৎপত্তি সেইরূপ টাঁকশালের অত্যন্ত নিম্নভাগেই আমাদের জন্ম।

সেদিন সিকি দু-আনির একটা মহতী সভা বসিবে কাগজে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন পড়া গিয়াছিল। হাতে কাজ ছিল না, কৌতূহলবশত গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেয়ালের কাছে একটা কোণে আশ্রয় লইলাম।

সুকুমারী সহধর্মিণী দু-আনিকে সযত্নে বামপার্শ্বে লইয়া শুভ্রকায় চার-আনিগুলি দলে দলে আসিয়া সভাগৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা বাস করে কেহ-বা কোটের পকেটে, কেহ- বা চামড়ার থলিতে, কেহ- বা টিনের বাস্ত্রে। কেহ কেহ- বা অদৃষ্টগতিকে আমাদের প্রতিবেশীরূপে আমাদের পাড়ায় ট্যাঁকের মধ্যেও বদ্ধ হইয়া দিনযাপন করে।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়টা এই যে, আমরা পয়সার সহিত সর্বতোভাবে পৃথক হইতে চাহি, কারণ, উহারা বড়োই হীন। দু-আনিরা সুতীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কহিল, এবং উহারা তাম্রবর্ণ ও উহাদের গন্ধ ভালো নহে। আমার পাশে একটি দু-আনি ছিল, সে ঈষৎ বাঁকিয়া বসিয়া নাসাগ্র কুণ্ঠিত করিল, তাহার পার্শ্ববর্তী চার-আনি আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল, আমি তো একেবারে সংকোচে সিকিপয়সা হইয়া গেলাম। মনে মনে কহিলাম, আমাদেরই তো আটটা ষোলোটা হজম করিয়া তোমাদের আজ এত মূল্য, সেজন্য কি কিছু কৃতজ্ঞতা নাই? মাটির নীচে তো উভয়ের সমান পদবী ছিল।

সেদিন প্রস্তাব হইল গৌরমুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রার জন্য স্বতন্ত্র টাঁকশাল স্থাপিত হউক। যদিও এক মহারানীর ছাপ উভয়ের উপর মারা হইয়াছে, তাই বলিয়া কোনোরূপ সাম্য আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা এক ট্যাঁক, এক থলি,

এক বাস্তবে বাস করিব না। এমন-কি, সিকি দু-আনি ভাঙাইয়া পয়সা করা ও পয়সা ভাঙাইয়া সিকি দু-আনি করা এরূপ অপমানজনক আইনও আমরা পরিবর্তন করিতে চাহি। সাম্যবাদের গৌরব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহার একটা সীমা আছে। গিনি মোহরের সহিত সিকি দু-আনি এক সাম্যসীমার অন্তর্গত, কিন্তু তাই বলিয়া সিকি দু-আনির সহিত পয়সা!

সকলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কখনোই নহে! কখনোই নহে! দু-আনির তীব্র কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চে শোনা গেল। যে খনিতে আমার আদিম উৎপত্তি সেই খনির মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় আমি বসুমতীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিলাম, বসুমতী সে অনুরোধ পালন করিল না- দেয়াল ঘেঁষিয়া রক্তবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় ঝঝঝঝ নূতন সিকি গড়াইয়া এই সিকি দু-আনির সভার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে দেখিলাম সকলকে ছাড়াইয়া উঠিল। সতেজে বক্তৃতা দিতে লাগিল, ঝঝঝঝ শব্দে চারি দিকে করতালি পড়িল।

কিন্তু আমি ঠাহর করিয়া শুনিলাম, বক্তৃতাটা যেমন হউক আওয়াজটা ঠিক রূপালি ছাঁদের নহে। মনে বড়ো সন্দেহ হইল। সভা যখন ভঙ্গ হইল, ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া বহুসাহসপূর্বক তাহার গায়ের উপর গিয়া পড়িলাম- ঠন্ করিয়া আওয়াজ হইল, সে আওয়াজটা অত্যন্ত দিশি এবং গন্ধটাও দেখিলাম আমাদের স্বজাতীয়ের মতো। মহা রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, তুমি কোথাকার অসভ্য হে! আমি কহিলাম, বৎস, তুমিও যেখানকার আমিও সেখানকার। ছোঁড়াটা আমাদের নিম্নতম কুটুম্ব- আধ-পয়সা; কোথা হইতে পারা মাথিয়া আসিয়াছে।

তাহার রকম- সকম দেখিয়া হা-হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দেখি, স্ত্রী পাশে শুইয়া কাঁদিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইলাম। ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম,

বড়ো ধরা পড়িয়াছে! কিন্তু মনে করিতেছি আমিও কাল হইতে পারা মাথিয়া
আপিসে যাইব।

আমার স্ত্রী কহিল, তাহার অপেক্ষা পারা খাইয়া মরা ভালো।

১৩০০

কথামালার নূতন- প্রকাশিত গল্প

একদা কয়েক জন কাঠুরিয়া এক পার্বত্য সরল বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে মনোযোগী হইয়াছিল। শ্রম লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর পরামর্শপূর্বক তাহারা এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। যে শাখা ছেদনের আবশ্যক কয়েক জনে মিলিয়া তাহারই উপর চড়িয়া বসিল এবং নিভৃতে বসিয়া সতর্কতার সহিত অঙ্গচালনা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শাখা ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং কাঠুরিয়া কয়েকটিও তৎসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কাঠুরিয়ার সর্দার এই সংবাদ-শ্রবণে অধীর হইয়া সেই তরুসমীপে উপস্থিত হইল এবং কুঠার আশ্ফালন করিয়া কহিল, “তুমি যে অপরাধ করিয়াছ আমি তাহার বিচার করিতে চাহি।”

বনস্পতি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, “হে জনপুঙ্গব, আমার স্কন্ধের উপর আরোহণ করিয়া আমারই শাখাচ্ছেদন করিয়াছ, এক্ষণে কে কাহার বিচার করিবে?”

মানব আরক্তলোচনে কহিল, “আমার কয়েক জন কাঠুরিয়া যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহার জন্য কেহই দণ্ড পাইবে না এ কখনো হইতে পারে না।”

বনস্পতি ভীত হইয়া কম্পিত মর্মরস্বরে কহিল, “প্রভু, তাঁহারা সুবুদ্ধিসহকারে মানবচাতুরী অবলম্বন করিয়া যেরূপ কাণ্ড করিয়াছিলেন, আশ্চর্য কার্যনৈপুণ্যবশত

অবিলম্বেই তাহার ফললাভ করিয়াছেন-আমি মূঢ় বৃক্ষ, তাহার প্রতিবিধান করি এমন সাধ্য ছিল না।’

মানব কহিল, “কিন্তু তোমারই শাখা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।’

বনস্পতি কহিল, “সে কথা যথার্থ, কারণ আমারই শাখায় তাঁহারা কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্য।’

মানব সুযুক্তিসহকারে কহিল, “অতএব তোমাকেই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। তোমার যাহা-কিছু বক্তব্য আছে বলিতে থাকো, আমি এক্ষণে কুঠারে সান দিতে চলিলাম।’

তাৎপর্য

অনবধানবশত যদি ছুঁচট খাইয়া থাক, চৌকাঠকে পদাঘাত করিবে। সেই জড়পদার্থের পক্ষে এই একমাত্র সুবিচার।

১২৯৮

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ

মীটিঙে প্রায় সকল দেবতাই একযোগে স্ব স্ব কর্মে রিজাইন দিতে উদ্যত হইলেন।

পিতামহ ব্রহ্মা বৈদিক ভাষায় উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত-সংযোগপূর্বক কহিলেন, “ভো ভো দেবগণ শৃঙ্খল।

“আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি তো এই বিশ্বসৃষ্টি এবং বেদরচনা সমাপ্ত করিয়া সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া পেনশন লইয়াছি। এমন-কি, আমার কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নাই বলিয়া সকলে আমার পূজা পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে। এবং আমার প্রথম বয়সের বিশ্ব এবং বেদ-নামক দুটো রচনা লইয়া লোকে নির্ভয়ে স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ এবং সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলে, রচনা মন্দ হয় নাই, কিন্তু আরও ঢের ভালো হইতে পারিত; কেহ বলে, আমাদের হাতে যদি প্রুফ-সংশোধনের ভার থাকিত তাহা হইলে ছত্রে ছত্রে এত মুদ্রাকরপ্রমাদ থাকিত না। আমি চুপ করিয়া থাকি, মনে মনে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলি, বাবা, ওই আমার প্রথম রচনা। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে অনেক পাকা হইয়াছ, কিন্তু তখন যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; একেবারে সমস্তই মন হইতে গড়িতে হইয়াছিল। তৎপূর্বে তোমরা যদি একটু মনোযোগ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে সমালোচনা শুনিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিতাম, একটি মস্ত স্ট্যাণ্ড পাওয়া যাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা বড়োই বিলম্বে জন্মিয়াছ। যাহা হউক, যখন দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবে তখন তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব।

“অম্মার কেহ কেহ, রচনা দুটো যে আমার তাহা একেবারে অস্বীকার করে। হয়তো অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিত ওটা তাহাদের নিজের, কিন্তু তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার খর্বতা স্বীকার করা হয় বলিয়া ক্ষান্ত আছে। হরি হরি! এই দীর্ঘজীবনে ওই দুটো বৈ আর কোনো দুষ্কর্ম করি নাই, ইহাতেই এত কথা শুনিতে হইল।

“যাহা হউক এ তো গেল আমার আক্ষেপের কথা। কিন্তু তোমরা কী মনোদুঃখে, মর্তলোকের প্রতি কী অভিমানে তোমাদের বহুকালের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?”

তখন দেবতারা কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক ভাষায়, কেহ-বা ত্রিষ্টুভ, কেহ-বা অনুষ্টুভ ছন্দে, দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব এবং তিন সয়ের উচ্চারণ রক্ষা করিয়া বলিলেন, “ভগবন্, সায়াস-নামক একটা দানব অত্যন্ত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহার নিকটে ব্র প্রভৃতি প্রাচীন অসুরদিগকে গণ্যই করি না।’

বৃদ্ধ পিতামহ মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, কোনোমতে মানে মানে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ, এখন তাহাকে গণ্য না করিলেও চলে। কিন্তু তখন যে নাকালটা হইয়াছিল সে বেশ মনে আছে। কিন্তু সে কথা আর উত্থাপন না করিয়া গম্ভীরভাবে চারিটি মস্তিক নাড়িয়া কহিলেন, “অবশ্য অবশ্য।’

সুরগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, “আর্য, শত্রুটাকে তত ডরাই না, কিন্তু মিত্রদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়াছি। এতদিন আমরা ছিলাম মানুষের হৃদয়লোকে বিশ্বাসের স্বর্গধামে; এখন তাহারা সায়াসের সহিত গোপনে সন্ধিস্থাপনপূর্বক সেখান হইতে নির্বাসিত করিয়া আমাদের মাথার খুলির এক কোণে অত্যন্ত শুষ্ক সংকীর্ণ জায়গায় একটুখানি স্থান দিতে চায়। সেখানে একফোঁটা বিশ্বাসের অমৃত নাই। বলে, দেখো, তোমাদের কত গৌরব বাড়িল। ছিলে অজ্ঞানান্ধ হৃদয়গহ্বরে, এখন উঠিলে মস্তিষ্কঘৃতজ্বালিত জ্ঞানালোকিত মস্তকচূড়ায়। ভাগ্যে আমরা কয়জনা বুদ্ধিমান ছিলাম, নতুবা স্বর্গে মর্তে কোথাও তোমাদের স্থান হইত না। আমরা সকলের কাছে প্রমাণ করিয়াছি যে, তোমরা আর কোথাও যদি না থাক, নিদেন আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে আছ। প্রতিবাদ করিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে বিচলিত করে এমন বুদ্ধিমান এখনো কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। বিষ্ণুর মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারগুলিকে আমরা এভোল্যুশন থিওরি বলিয়া প্রচার করিয়াছি। দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি।

“ভগবন্, যথার্থ আন্তরিক ভক্তি কখনোই নিজের দেবতাকে লইয়া এরূপ ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করে না। দেব চতুরানন, এতকাল দেবতা ছিলাম, কেবল মাঝে মাঝে দৈত্যদের উপদ্রবে স্বর্গছাড়া হইয়াছি, কিন্তু এপর্যন্ত আমাদিগকে কেহ এভোল্যুশন থিওরি করিয়া দেয় নাই। প্রভু, তুমি যদি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাক তুমি জান আমরা কী, কিন্তু আজকাল তোমার অপেক্ষা যাহারা কিঞ্চিৎ বেশি শিখিয়াছে তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করো। বড়ো আশা দিয়াছিলে তোমরা দেবতারা অমর, কিন্তু এইভাবে যদি কিছুদিন চলে, আমাদের মানববন্ধুরা যদি সাংঘাতিক স্নেহভরে আরও কিছুকাল আমাদের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তবে সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।’

বৃহস্পতির মুখে এই-সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা আর উত্তর করিতে পারিলেন না, চারিটি শুভ্র মস্তক নত করিয়া চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন দেবতাগণ স্ব স্ব পদ সম্বন্ধে পরিবর্তন প্রার্থনা করিলেন। বিজ্ঞ দেবতা প্রজাপতি এবং বালক দেবতা কন্দর্প সুরসভায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, “সকলেই জানেন, বিবাহ- ডিপার্টমেন্টে বহুকাল আমাদের কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব ছিল; সেজন্য আমাদের কোনোরূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপরি-পাওনা ছিল না বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি টাকা-নামক একটা চক্রমুখো হঠাৎ-দেবতা টঙ্কশালা হইতে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ- চন্দ্রাকারে আবির্ভূত হইয়া একপ্রকার গায়ের জোরে আমাদের সে কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব উক্ত ডিপার্টমেন্ট হইতে আমাদের নাম কাটিয়া আজ হইতে সেই প্রবলশক্তি নূতন দেবতার নাম বাহাল হউক।’

সর্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

তখন যম উঠিয়া কহিলেন, “এতকাল আমিই নরলোকের সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ ছিলাম, কিন্তু এখন সেখানে আমা অপেক্ষা ভয় করে এমন-সকল প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব, পুলিশ-দারোগাকে আমার যমদণ্ড ছাড়িয়া দিয়া আমি অদ্য হইতে কাজে ইস্তফা দিতে চাই।’

অধিকাংশ দেবতার মতে যমরাজের প্রভাব নিতান্ত অসংগত না হইলেও ব্যাপারটা গুরুতর বিধায় আগামী মীটিঙে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আপাতত স্থগিত রহিল।

কার্তিকেয় উঠিয়া কহিলেন, “গুরুদেবের বক্তৃতার পর আমাকে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না। আমি দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবতাগণকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, হয় আমার পোস্ট্ অ্যাবলিশ করিয়া এস্টাব্লিশমেন্ট্ কমানো হউক, নয় কোনো সাময়িক পত্রের সম্পাদকের উপর স্বর্গরক্ষাকার্যের ভার দেওয়া হউক। এমন-কি, আমার বহুকালের ময়ূরটিও আমি বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। ইহার পেখম ছড়াইলে তাঁহাদের অনেকটা বিজ্ঞাপনের কাজ হইবে।’

দেবতাদের সম্মতিক্রমে সেনাপতির পোস্ট্ অ্যাবলিশ হইল, এখন হইতে ময়ূরের খোরাকি তাঁহার নিজের তহবিল হইতে পড়িবে।

বরুণ উঠিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিলেন, “নরলোকে আমার কি আর কোনো আবশ্যক আছে? খোলাভাঁটিবাহিনী বারুণী আমাকে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিয়াছে। এইবেলা মানে মানে সময় থাকিতে সরিতে ইচ্ছা করি।’

দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই। কারণ, এখনো সময়ে সময়ে বারুণীর প্রার্থ্য নিবারণের জন্য দুর্বল মানব বরুণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

তখন ধর্ম বলিলেন, “লোকাচারকে আমার অধীনস্থ কর্মচারী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে পরামর্শমাত্র না করিয়া আপন ইচ্ছামতো যাহা-তাহা করে, তবে সেই ছোঁড়াটাকেই সিংহাসন ছাড়িয়া দিলাম।’ বায়ু কহিলেন, “পৃথিবীতে এখন উনপঞ্চাশ দিকে উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতেছে, চাই-কি, এখন আমি অবসর লইতে পারি।’ আদিত্য কহিলেন, “মানবসমাজে বিস্তর খদ্যোত উঠিয়াছে; তাহার মনে করিতেছে, সূর্য না হইলেও আমরা একলা কাজ চালাইতে পারি। জগৎ

আলোকিত করিবার ভার তাহাদের উপর দিয়া আমি অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।’ ভগবান চন্দ্রমা গুরুপ্রতিপদের কৃশমূর্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, “নরলোকে কবিরা তাঁহাদের প্রেয়সীর পদনখরকে আমা অপেক্ষা দশগুণ প্রাধান্য দিয়া থাকেন, অতএব যে পর্যন্ত কবিরমণী-মহলে পাদুকার সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্যন্ত আমি অন্তঃপুরে যাপন করিতে চাই।’ এমন-কি, ভোলানাথ শিব অর্ধনিমীলিত নেত্রে কহিলেন, “আমা অপেক্ষা বেশি গাঁজা টানে পৃথিবীতে এমন লোকের তো অভাব নাই; সেই-সমস্ত সংস্কারকদিগের উপর আমার প্রলয়কার্যের ভার দিয়া আমি অনায়াসে নিশ্চিত থাকিতে পারি। এমন-কি, আমি নিশ্চয় জানি, আমার ভূতগুলারও কোনো আবশ্যক হইবে না।’

সর্বশেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত মধুর স্বরে দেবসমাজে তাঁহার নিবেদন আরম্ভ করিলেন, তখন দেবগণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহেন্দ্রের সহস্র চক্ষের পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

দেবী কহিলেন, “অন্যান্য নানা কার্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপর ছিল, কিন্তু সে কার্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে- তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে-সকল পুস্তক নির্বাচিত হয় সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভালো হয়। অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের প্রতি উক্ত ভার দেওয়া হউক।’

যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, “আমার কোনো আবশ্যক নাই, কারণ, ইন্স্কুলের মাস্টার এবং ইন্স্পেক্টর আছে।’

শিশুশিক্ষা-বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোনো মতভেদ রহিল না।